জরিনা

আবুল বাশার

আমি জরিনাকে তার ছবি আঁকার খোদায়ী গুণ দেখে শাদি করেছিলাম। আমার নাম রাসেল মল্লিক। আমি শাসন পঞ্চায়েত অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্স-এর চাকরি করি। জরিনাও বেকার রাঙাবেলিয়া গোসাবায় অঙ্গনওয়াড়িতে কাজ পেয়েছে। দু'জনেরই ছোট চাকরি। কিন্তু আমরা খুশি। আমরা সুখীও নিশ্চয়। ওর কাজের জায়গাটা নদীর ধারে। ওপারে সুন্দরী গরানের বন। বাঘ আছে।

একটাই ভয়। যদি বাঘ আসে।

দু'জন দুই জায়গায় থাকি। সপ্তাহান্তে হয় জরিনা শাসনে আসে, নয়তো আমি রাঙাবেলিয়া যাই। এ সপ্তায় আমার যাওয়ার কথা। হঠাৎ একটা চিঠি এসে পৌঁছল।

জরিনা লিখেছে, সেলফোনে বলা যায় না বলে, চিঠি লিখতে হল। আমি দিকশূন্যপুরে নানির কাছে এসেছি, মাসখানেক এখানে থাকতে হবে। নানি খুব অসুস্থ। এখন এসো না। তাছাড়া ফোনেও কথা হবে না। নানির এখানে টাওয়ার ধরে না; ওদিককার কথা শোনা যায় না। আবার তোমাকে চিঠি লিখব। ভালো থেকো। ইতি তোমারই জরিনা।

অবাক লাগল। মনটা দমেও গেল। নতুন বিয়ে হয়েছে। এই অবস্থায় বউকে না দেখে থাকা যায়! তারপর ভাবলাম, সত্যিই হয়তো নানি নিতান্ত অসুস্থ। জরিনা মিথ্যে বলবে না। এই ঘরে একা শাসনে পড়ে রইলাম। পরের সপ্তাহে চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। চিঠি কিন্তু এল না।

দিকশূন্যপুরে কখনও যাইনি। বাস্তবিকই ওই নামে দক্ষিণে একটি জনপদ রয়েছে; যেমন 'পাথর দাবি' নামে একটি গ্রাম রয়েছে। নানিকে শুধু বিয়ের রাতে দু'চার-নজর দেখেছি।

নানি বলেছিলেন, বলি কী ভাই, জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ; আমর নাতিন রে বুক দিয়ি আগলায়ে রাখিয়ো; অঙ্গনওয়াড়ির চাকরি, ছেড়ি গেলে নুকসান; না হলি কইতাম নাতিন রে জন্মের মতন শাসনে নিয়ি যাও, কাছে রাইখ্যে থিতু হও। ক্বচিৎ আসে দক্ষিণরায়, কিন্তু আসে তো! মারে মারুক; কিন্তু থাবায়ে রাইখ্যে গেলে মানুষের সেই রূপ আর সহ্য হয় নে বাপু! শাদি মোবারক ভাই; এমন সাঁঝবেলায় দক্ষিণরায় রে স্মরণ করতি নাই। হা বনবিবি; আমার সন্তান রে তুমি দেখিয়ো, যতন করিয়ো মা!

নানির কথা সব কানে আজও বাজে। কী কথার ধাত, কী নির্মম। থাবা শব্দের অমন

ব্যবহার কখনও শুনিনি। এই দক্ষিণের লোকও নই। আমি মুর্শিদাবাদী নির্মাণ-মিস্তিরির ছেলে। বাবা ছিলেন মুখ্যত দালান-মিস্ত্রি। সোনারপুর এলাকায় এসে কাজ ধরেন এবং থেকে যান; একটা আস্তানাও গড়ে নেন। তাঁরই সন্তান আমি। লেখাপড়া শিখেছি। উচ্চ ডিগ্রি গোপন করে, উচ্চ মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট দর্শে এই চাকরিটা জোগাড় করেছি। বরাবরই আমার নানান শিল্পকলার দিকে ঝোঁক। চাকরি পাওয়ার আগে দক্ষিণের ট্রেনে মাইক লাগিয়ে ট্রেনের কামরায় কিশোর-কণ্ঠী গানের মাধুকরী বা ফিরি করতাম। সাহস করে টিভির পর্দায় দেখানো গানের রিয়েলিটি শো-তে পার্টিসিপেট করে শেষ রাউন্ড পর্যন্ত উঠেছিলাম।

ফলে দক্ষিণে আমার একটা নামডাক হয়। দোখনোগানের এক জলসায় শ্রোতার আসনে জরিনাকে দেখি— গান শেষে ও আমার কাছে এসে আলাপ করে এবং মুগ্ধতা প্রকাশ করে। জরিনা সুন্দরী; আমাকে ওদের বাড়ি যাওয়ার জন্য বলে সে। আমার মোবাইল ফোনের নম্বর পর্যন্ত নেয়। ফোনে আমাদের কথা হত। একদিন ওদের বাড়ি গেলাম।

জরিনাদের বাড়ি গিয়ে অবাক হই। মাটির বাড়ি, খড়ের চাল। দু'খানা ঘর; তা-ও ছোট-ছোট— উঠোন আছে মাটির। কিন্তু ঘরের দেওয়ালে পাকা হাতের আদিবাসী-টেরাকোটা মোটিফের চিত্রকলা— এমনকি দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ছাঁদের নারীমুখ এঁকেছে জরিনা।

জরিনা বলল, আমি নকল করতেও পারি, নিজের করতেও পারি।

— কোথায় শিখলে?

— আমার কোন গুরু নেই। মাধব চিত্রকর, আমাকে কিছুটা দেখিয়ে-টেখিয়ে দিতেন; তিনিও আর নেই। একা-একা যেমন আসে করি। যে-দেখে সে-ই বলে, বড় ঘরে জন্মালে আমার দেশজোড়া নামডাক হত। ওস্তাদের ঘরে জন্মালে আপনি যেমন বড় গায়ক হতেন সেই রকম। সে যাই হোক, আমি কিন্তু আঁকতে ভালবাসি। ইজেলে-ক্যানভাস করেছি। দেখবেন সেগুলো?

দেখতে দেখতে আমি থ হয়ে গেলাম। আমি জরিনার প্রতি আশ্চর্য এক আকর্ষণ টের পেলাম। মানে হল, এ কোন সুন্দরের কাছে এসেছি আমি।

ছবিগুলো দেখানোর পর আমার বিস্মিত চোখের দিকে চেয়ে জরিনা বললে, কিন্তু যে সমাজে থাকি, সেখানে চিত্রচর্চা পাপ। বাপ নেই বলে আরও অসুবিধা। মা বিধবা। একপ্রকার চেয়েচিন্তে মা আমাকে মাধ্যমিক পাশ করিয়েছে; হায়ার সেকেন্ডারি অসম্পূর্ণ, এখন আমি কাগজের কাঠের মুখোশ বানিয়ে মেলায় গিয়ে বেচে আসি। এভাবে তো চলবে না। মা বিয়ে দিয়ে মুক্তি চাইছে; দায়মুক্তি বলতে পারেন। অঙ্গনওয়াড়িতে যদি

চাকরিটা হয়ে যায়, তা-ও কিছুটা বাঁচি। মোল্লারা খুব চাপ দিচ্ছে। কী করি বলুন তো। কিছু মনে করবেন না, বেহায়াও ভাববেন না আমাকে, আমি কোনও ওয়াক্তি মৌলবি বিয়ে করতে পারব না। তাঁরা ভালো মানুষ, ধার্মিক মেয়ে অনেক আছে সংসারে। আমাকে কেন? আসলে কী জানেন, কারা যেন আমার হাতের তুলিটা কেড়ে নিতে চাইছে।

আমি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, বুঝলাম।

— কী বুঝলেন?

— এ যে আমারও সমাজ জরিনা। বুঝব না। তোমার হাতের তুলি, বিদ্যমান কীসে হয় ভাবতে হবে।

— বিদ্যমান?

— ওই আর কী! বজায় কীসে থাকে!

— কীসে?

— আমি তোমার জন্য পছন্দের ছেলে দেখব।

— শুধু দেখবেন বিয়ের পর তুলিটা যেন কেড়ে না নেয়।

— সে বড় কঠিন কথা হল জরিনা। দেখতে মোল্লা নয়, শিক্ষাও আছে, অথচ ছবিগানের-গোঁড়া-দুশমন সমাজে অনেক, যুবক সে, গান শোনে, ছবি দেখে, ছায়াছবি দেখে, মাথার চুলে ফাঁট আছে— বিয়ের পর দেখা গেল, প্রথমেই তোমার হাতের তুলি কেড়ে নিয়ে জ্বলন্ত উনানে দিলে। কী করে বুঝব বলো তো? আচ্ছা, কীসের মুখোশ করো তুমি?

— কেন দক্ষিণরায়ের মুখ।

— তার মানে বাঘ!

—জি।

অবাক হয়ে কী যেন কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম।

তারপর বললাম, বাঘের মুখোশ করো কেন?

জরিনা বলল, রয়েল বেঙ্গল বাঘ ভারী সুন্দর।

— ভয়ংকর একটা জীব, তাকে তুমি সুন্দর বলছ?

— হ্যাঁ বলছি। সুন্দর, ভয়ংকর হলেও সুন্দর।

— ভয়ও তো করে।

— করে। জগতের লোক সেই ভয়ংকর সুন্দরকেই তো দেখতে আসে। ভয় করে, আবার গর্বও হয়; এমন বাঘ আর আছে কোথায় বলুন!

— আর বলো না। গোসাবার বিধবা-পল্লির সব বিধবা ওই বাঘের মুখে স্বামী খুইয়ে বিধবা। মধু ভাঙতে জঙ্গলে গেল, বাঘে সাবাড় করে দিলে। তোমরা মউলে?

— জি। বলে মাথা নেড়ে জরিনা বলল, আমার বাপুকেও বাঘে নিয়েছে। তবু বলছি, বাঘ সুন্দর।

— বুঝলাম না। আচ্ছা, আসি এখন।

— আপনি ভয় পেয়েছেন।

এই বলে শব্দ করে জোরে-জোরে হাসতেই থাকে জরিনা। তাকে দেখায় আরও সুন্দর।

তারপর জরিনা হাসতে হাসতে বলে, মউলে যারা, জঙ্গলে মধু ভাঙে, তারা বাঘের সঙ্গেই ঘর করে, তামাম সুন্দরবনের মানুষ, আমরা কেউ না কেউ— সেই হিসেবে সবাই, আমরা সকলে বাঘের সঙ্গে লড়েই তো বেঁচে আছি।

বলতে বলতে হাসি থেমে যায় জরিনার।

এই জরিনাকেই আমি বিয়ে করেছি। বিয়ের সন্ধ্যায় নানির কথা শুনে বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করতে লাগল। মনে হল, কোনও মৃত্যুরই সঙ্গে আমার বিবাহ হল না তো? তারপর ভাবলাম, এখানকার লোককে বাঘে খায়, কুমিরে জলে টেনে নিয়ে যায়। তবু এখানে বিয়েশাদি বন্ধ থাকে না। আমার ইচ্ছে নয় যে, জরিনা এখানে থাকে। কিন্তু ওর চাকরিটা যে এখানেই।

জরিনা আমার মনের কথা কেমন করে যেন টের পেয়ে যেত।

বিয়ে করে শাসনে এসে যখন ওকে বিছানায় কাছে পেলাম, তখন রাত হয়েছে।

জরিনাকে বললাম, খুলবে না?

জরিনা বলল, হ্যাঁ।

সে কানের গলার নাকের একটা-একটা করে ধীরে ধীরে খুলতে থাকে আর নির্নিমেষ আমার মুখে তাকায়। ওর পলকহারা, মায়াজড়ানো চাউনি আজও মনে পড়ে।

সে নিজেকে খুলতে-খুলতে বলে, ভয় পেয়ো না রাসু। যেখানে কাজ করি, ওখানে নদীর খুব উঁচু খাঁড়ি, দক্ষিণরায় আসবে না। বারো বছর আগে মাত্র একবার এসে থাবা মেরেছিল। যদি ভয়ে-ভয়ে থাকো, সুখ করতে পারবে না। বলতে বলতে আরও খুলতে থাকে নিজেকে। বুকের শাড়ি স্খলিত হয়েছে। বুক দুটি জামা ঠেলে ফেটে পড়তে চাইছে। বুকের আকৃতি ক্ল্যাসিক-গোল বলে মনে হচ্ছে। দেখা গেল, আমার চোখ ব্লাউজের আড়াল এবং ব্রা-এর বাঁধুনি ঠেলে দ্রুপদী স্তন যুগলকে ঠিকই আভাসিত করেছিল। ব্লাউজ খুলে বাহুমূলে আমাকে রেখে জরিনা শুধাল, কেমন? তোমার পছন্দ হয়? দেখো, ভালো করে। ভয় পেয়ো না। এ সবই তোমার জন্য সারা জীবনের উপহার। আমার গাঁথুনি ভালো; সহজে ঢলে পড়বে না, শোনো, আগে দেখে নাও, তারপর হাত লাগাবে।

আমি থাবা গুটিয়ে নিই।

জরিনা বলল, আমার তো মনে হয়, তোমাকে আমি বুক দিয়ে আগলে রাখব, বুকের এই খাঁজে তোমার মুখ এবং চোখ দুটো ডুবে যাবে, আমার শরীরে সুঘ্রাণ আছে, কোনও বাঘিনির মতো বোঁটকা গন্ধ তুমি পাবে না। নাও, এসো। শরীরের সবখানে তুমি দৃষ্টি বুলাবে। যদি দেখো তো দেখবে, আমার যৌনফুল মধুরা। আমি বেশুমার সাহিত্য পড়ি, আঁকতে হলে পড়তে হয়। আমি এখানকার লাইব্রেরির মেম্বার। নাও, এসো। যত দেখবে, ভয় কেটে যাবে।

বললাম, তোমার দেহ শিল্পীর ভাস্কর্যের মতন; ধাতুর মতো দৃঢ় আর পেলব। দৃঢ় এবং নরম। বেহেস্তের ফুলের মতন, কী বলে, সুগন্ধিত। মনে কোরো না বাড়িয়ে বললাম। কিন্তু ওকী! দরজায় কী যেন নখর আঁচড়ায় জরিনা।

দরজা খুলে দেখা গেল কিছু নেই।

দ্বিতীয় সপ্তাহেও জরিনার চিঠি এল না। ফোনে চেষ্টা করেও পেলাম না। আমার আর ধৈর্য রাখা দায়।

বিয়ের রাতেই জরিনা বলেছিল, এই রূপ যদি নষ্ট হয়ে, কারও নখরে এঁটো কী তিহিসনিহিস (তছনছ) হয়, আমাকে তালাক করিয়ো রাসু। এসো, ভয় কেন করো। আকাশের ফরিস্তা দেখছেন, আমরা আরও সুখে ভাসছি; হে বনবিবি আমার লখিন্দর রে রক্ষা করো মা।

অবশেষে চিঠি এল। জরিনা লিখেছে—

চিঠি দিতে দেরী হল। ডাক্তার বলেছেন, ছয়মাস নানির সেবা লাগবে। নানি একা। দিকশূন্যপুরে আমার ছমাস থাকতেই হচ্ছে অগত্যা। তুমি রাঙাবেলিয়া না এলেই ভালো করবে। কারণ, শনি-রবি নানির কাছ থেকে নড়বই না। অন্যদিনগুলোয় সেন্টারে শুধু হাজিরা দিয়ে চলে আসি, যা হোক করে ম্যানেজ দিতে হচ্ছে। লক্ষ্মীসোনা রাগ কোরো না। আমি তোমারই সোনা। ছ'মাস কষ্ট করো। তারপর এসো। যদি জোর করে আসো, কশিমভাইকে সঙ্গে এনো। হয়তো উনি দিকশূন্যপুর চিনবেন। মুখ এখন এঁটো হয়ে রয়েছে। তবু তোমাকে চুম্বন দিলাম। ঘৃণা কোরো না। প্লিজমগ ইতি তোমারই জরিনা।

কাশিম ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার। তাঁকে কেন? তাঁকে সঙ্গে নেব কেন? কাশিমই তো আমাদের বিয়ে দিয়েছেন। দিকশূন্যপুর কাশিম চিনবেন। আমি কি চিনে নিতে পারব না? এঁটো চুম্বনের মানে কী? নাকি জরিনা কিছু খেতে খেতে চিঠিটা লিখেছে বলে এঁটো? নাকি তাকে বাঘে খেয়ে দিয়ে গেছে? কী সর্বনাশ। এ সব কী ভাবছি আমি? বিয়ের রাতেও ভুল করে ভেবেছিলাম, কীসে যেন দরজায় আঁচড়াচ্ছে। দরজা খুলে দেখি, কিছু

নেই। তাহলে কি এই যে, কিছুই তিহিসনিহিস হয়নি; আমিই কেবল ভয়ে মরলাম? কথায় বলে, বনের বাঘে খায় না; মনের বাঘে খায়। আমাকে কি তাহলে মনের বাঘে সাবাড় করে চলেছে? আমাকে বাঁচাও জরিনা। জরিনাকে আমি জরিন ডেকে খুব সুখ পাই। মনে মনে আর্তনাদ করে উঠি, 'বাঁচাও'।

কাশিমভাইকে নিয়ে রাঙাবেলিয়া এলাম। আগে খোঁজ নিই, কী হয়েছে। তারপর দিকশূন্যপুর যাব।

রাস্তায় এক কিশোর আমাদের দেখে বলল, অ্যাদ্দিনে এলেন জামাইবাবু। ওপাড়া যান। দেখতি পাবেন, কেমন কইরে থাবায়ে গেছে। সিধা কাঁঠালবাগান যাবেন। দেখবেন মানপাতায় মুখ ঢেকি শুয়ে আছে। গাছতলায় যান। কী সাধের জেবন কেমন হইল জামাইবাবু। যান, যান। খালি দাঁড়ায়ে দেখেন কী?

গল্প এই যে, প্রকাণ্ড মানপাতায় মুখ ঢেকেছে জরিনা।

জরিনকে ডেকে উঠতে আমার গলা কেঁপে গেল।

— জরিন। কাশিমভাইকে সঙ্গে এনেছি জরিন। পাতা সরাও। তোমাকে দেখি।

— না রাসু। হয় না। দূরে থাকো। কাছে এসো না।

— আমি তোমাকে যে দেখব বলে এসেছি।

— দেখতে চেয়ো না। আমাকে তালাক দাও। তালাকের সাক্ষী কাশিমভাই। দাও, তালাক দিয়ে শাসন ফিরে যাও রাসেল। খোদা আমাকে যেভাবে এঁকে দিয়েছেন— এরপর আর দেখতে চেয়ো না তোমার ভয় করবে।

জরিনের এমন কথায় কি মহাকাশে অবস্থিত খোদার আরশ (সিংহাসন) কেঁপে উঠল না! বিদীর্ণ হল না সহস্র ক্যানভাস? শিল্পীকে তুমি এমনই কষ্ট দিলে ওহে দক্ষিণ রায়! মা বনবিবি, তুমি তো জরিনকে যত্ন করলে না— আমার গলার গান তুমি শুকিয়ে দিলে কেন জঙ্গলমহলের দেবী! আমি কোথায় ফিরব! না, আমি পারব না।

— পাতা সরাও জরিন।

— তালাক দাও।

আমি আর কাশিম চুপচাপ ঘরে চলে আসি। আমাদের পায়ের শুকনো পাতা মাড়ানো শব্দে ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে জরিন, মা গো! ফের দক্ষিণরায় আসতেছি মা! আমাকে ভক্ষণ করুক, তুমি দেখিয়ো না। যাও রাসু। পালাও।

মুখের থাবার ছিন্ন ক্ষত শুকায় ছয়মাসে। তারপর শাসনে একটি গৃহে গভীর রাতে আমরা দু'জন। আমি জরিনাকে ভোগ করছি। ও তার মুখ ওড়নায় ঢেকে রেখেছে।

এটাই শর্ত। সম্ভোগ সময়ে আমি জরিনার মুখ দেখব না। নিষ্প্রভ নীল আলোয়

আমাদের সুখের ঘরখানি যেন বা দিব্যালোকের মতো সুন্দর হয়েছে। বাঘ শুধু মুখের ওপর মেরে গেছে; শরীর স্পর্শ করেনি। জরিনার বক্ষো পূর্ণিমায় ঈশ্বরের তুলি বিস্ময়-গান এখনও গেয়ে চলেছে। আমি ভাবছি, শর্ত যখন, তার মুখে চাইব না অতএব।

কিন্তু নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অভিজ্ঞতা আদম-ইভের ছিল। যেখানে মানা, সেখানেই ভক্ষকের ক্ষুধা চোখ মেলে।

আমি কি মাথা খারাপ করার মতো পাগল? যৌন-আবেগে আমি কি দানব? আমি কি ভালোবাসায় ফতুর? আমি কি স্ত্রীদেহে সমগ্রকে পাচ্ছি না বলে বিহ্বল ও কাতর?

চরম-পুলক-মুহূর্তে তার মুখের ওড়না সরিয়ে দিলাম।

একটি কুটানো শিলার মতো মুখ। ছিঁড়ে-ছিঁড়ে গেছে। নীল আলোয় খোদিত করেছে বনবিবির বৃত্তান্ত আর দক্ষিণ রায়ের রাজকীয় ইতিহাস— মনে হল, হে খোদা, তবু এ মুখ এখনও সুন্দর— সুন্দর কঠিন। শিউরে ওঠার মতো বীভৎস, তথাপি সুন্দর।

চরম-পুলক শেষে আমার চোখে জল এসে গেল।

জরিন তারপর আমাকে সর্বাঙ্গে বাঘিনির মতো আরাম দিতে লেহন করে চলল।